মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

আয়াতের শেষাংশে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল, সমস্ত আসমান-যমীন যাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন।

অতপর ইরশাদ হয়েছে ঃ- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ একথা যখন জানা হয়ে গেছে যে, মহানবী (সা) সমস্ত বিশ্ব-সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত রসূল, তাঁর আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় নেই, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর সে রসূলের প্রতি ঈমান আনাও অপরিহার্য হয়ে গেছে, যিনি নিজেও আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান আনেন। আর তাঁরই আনুগত্য অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সঠিক পথে থাকতে পার।

আল্লাহ্র 'কালেমাত' বা বাণীসমূহ বলার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র কিতাব তওরাত, ইঞ্জীল, কোরআন প্রভৃতি আসমানী গ্রন্থ। ঈমানের নির্দেশ দেওয়ার পর আবার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মহানবী (সা)-র শরীয়তের আনুগত্য ছাড়া শুধুমাত্র ঈমান আনা কিংবা মৌখিক সত্যায়ন করাই হিদায়তের জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য নবী করীম (সা) কর্তৃক বাতলানো পথ ছাড়া অন্য সমস্ত পথই বন্ধ।

হযরত মূসা (আ)-র সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল ঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-র সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে।

বিগত আয়াতসমূহে মূসা (আ)-র সম্প্রদায়ের অসদাচার, কূট তর্ক এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটিই এমন নয়; তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভালও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়-ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব লোক, যারা তওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হিদায়ত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন (সা)-এর

আবির্ভাব হয়, তখন তওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণও করে। বনি ইসরাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কোরআন মজীদে বারংবারই করা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ— مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্যনিষ্ঠ, সারারাত ধরে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। অন্যত্র রয়েছে ঃ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ যাদেরকে মহানবী (সা)-র পূর্বে কিতাব (তওরাত ও ইঞ্জীল) দান করা হয়েছিল, তারা মহানবী (সা)-র উপর ঈমান আনে।

প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর (র) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জমাআত বা দল দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য, যারা বনি ইসরাঈলদের গোমরাহী, অসৎকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনি ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল, যারা নিজেদের জাতির কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদিগারে আলম! আমাদের এদের থেকে সরিয়ে কোন দূর দেশে পুনর্বাসিত করে দিন, যাতে আমরা আমাদের দীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ্ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দেড়শ বছরের দূরত্বে দূর-প্রাচ্যের কোন ভূ-খণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানে তারা নির্ভেজাল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহ্‌র মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মি'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আ) হুযূর (সা)-কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা মহানবী (সা)-র উপর ঈমান আনে। হুযূর আলাইহিস-সালাতু ওয়াস্‌সালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি মাপ-জোখের কোন ব্যবস্থা আছে? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল, আমরা জমিতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দিই। সেই স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপ-জোখের কোন প্রয়োজন পড়ে না। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা নিবেদন করল, না। কারণ কেউ যদি তা করে, তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সবার ঘরবাড়িগুলো একই রকম কেন? নিবেদন করল, তা এজন্য যাতে কেউ কারোও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতপর হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে

রেখেছ? নিবেদন করল, যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতপর হুযুর (সা) যখন মি'রাজ থেকে মক্কায় ফিরে এলেন তখন এ আয়াতটি নাযিল হল ঃ وَمِنْ قَوْمِ مُوسٰى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُونَ তফসীরে কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যতার কথাও লিখেছেন। ইবনে-কাসীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবত এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়।

যাহোক, এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, হযরত মূসা (আ)-র সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। তা তারা হুযুর (সা)-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনি ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্রই হোক, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর কোন বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে রেখেছেন, যেখানে যাওয়া অন্য কারোও পক্ষে সম্ভব নয়। (আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞানী।)

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوسٰٓى إِذِ
اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ أَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا
عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۚ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ
قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا
حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ ۚ سَنَزِيْدُ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ
لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

(১৬০) আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বারজন পিতামহের সন্তানদের বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মূসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অতপর এর

ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ! প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ঘাঁটি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া'। যে পরিচ্ছন্ন বস্তু জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। বস্তুত তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই। (১৬১) আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হল যে, তোমরা এ নগরীতে বসবাস কর এবং খাও তা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা এবং বল, আমাদের ক্ষমা করুন। আর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর প্রণত অবস্থায়। তবে আমি ক্ষমা করে দেব তোমাদের পাপসমূহ। অবশ্য আমি সৎকর্মীদের অতিরিক্ত দান করব। (১৬২) অনন্তর জালিমরা এতে অন্য শব্দ বদলে দিল তার পরিবর্তে, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি আসমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি (একটা পুরস্কার বনি ইসরাঈলকে এই দান করেছি যে, তাদের সংশোধন ও ব্যবস্থাপনার জন্য) তাদের বারটি গোত্রে বিভক্ত করে সবার পৃথক পৃথক দল সাব্যস্ত করে দিয়েছি (এবং প্রত্যেকের দেখাশোনার জন্য একজন সর্দার নিযুক্ত করে দিয়েছি যার আলোচনা সূরা মায়েদার তৃতীয় রুকূতে وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا আয়াতে করা হয়েছে)। আর (একটি পুরস্কার হল এই যে,) আমি মূসা (আ)-কে তখন নির্দেশ দিলাম, যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কাছে পানি চাইল (এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করলেন,) তখন নির্দেশ হলো, আপন হাতের এই যষ্ঠির দ্বারা অমুক পাথরের উপর আঘাত করুন (তাহলেই তা থেকে পানি বেরিয়ে আসবে)। সুতরাং (আঘাত করার) সঙ্গে সঙ্গে পানির বারটি ধারা (তাদের বার গোত্রের সংখ্যানুপাতে) প্রবাহিত হলো। (বস্তুত) প্রত্যেকেই আপন আপন পানি পান করার স্থান চিনে নিল। আর (একটি পুরস্কার হলো এই যে,) আমি তাদের উপর মেঘমালাকে ছায়াদানকারী করেছি। আর (এক নিয়ামত এই যে,) তাদেরকে (গায়েবী ভাণ্ডার হতে) 'মান্না' ও 'সালওয়া' পৌঁছে দিয়েছি এবং অনুমতি দান করেছি যে, (সেই) উৎকৃষ্ট সামগ্রী থেকে খাও, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। (কিন্তু এতেও তারা নির্দেশবিরুদ্ধ একটি ব্যাপার করে বসল—) এবং তাতে তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি বরং নিজেদেরই ক্ষতি (সাধন) করছিল। (এসব ঘটনা 'তীহ' মরূদ্যানে ঘটেছিল যার বিস্তারিত বিশ্লেষণ 'মা'আরেফুল কোরআন'-এর প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।) আর (সে সময়ের কথা স্মরণ কর,) যখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তোমরা সে জনপদে গিয়ে বসবাস কর এবং ভক্ষণ কর সেখানকার (বস্তু-সামগ্রীর) মধ্য থেকে

যেখানেই তোমাদের ভাল লাগে। আর (এ নির্দেশও দেওয়া হয় যে, যখন তোমরা ভেতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করবে, তখন) মুখে বলতে থাকবে—তওবা করছি (তওবা করছি) এবং (নম্রতার সাথে) প্রণত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাহলেই আমি তোমাদের (বিগত) পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব। (মার্জনা তো সবারই জন্য। তবে) যারা সৎকাজ করবে তাদেরকে এর উপরেও অধিক পরিমাণ দান করব। অনন্তর সে জালিমরা সে বাক্যটিকে অন্য বাক্যের দ্বারা বদলে দিল যা ছিল সে বাক্যের বিপরীত যা তাদেরকে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে আমি তাদের উপর এক আসমানী বিপদ পাঠিয়েছি এ কারণে যে, তারা নির্দেশের অবমাননা করত।

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ
فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا
يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾
وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ
مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۭ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ
السُّوْۗءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۢ بَـِٔيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً
خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾

(১৬৩) আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদী তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশ ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ তারা ছিল নাফরমান। (১৬৪) আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান—কঠিন আযাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়। (১৬৫) অতপর যখন তারা সেসব বিষয়

ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদের নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না-ফরমানীর দরুন। (১৬৬) তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি সেই (আপনার সমকালীন ইহুদী) লোকদের কাছে (সতর্কীকরণ স্বরূপ) সেই জনপদের (অধিবাসীদের) সে সময়ের অবস্থা জিজ্ঞেস করুন, যারা সাগরের নিকটবর্তী (অঞ্চলে) অবস্থিত ছিল। (সেখানকার ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর শনিবার দিন শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল।) যখন তারা (সে জনপদের অধিবাসীরা) শনিবার (সম্পর্কিত নির্দেশ)-এর ব্যাপারে (শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত) সীমালংঘন করছিল, যখন তাদের (নিকট) শনিবার দিনটি আসত, তখন (তাদের) সেই (সাগরের) মাছগুলো (পানির ভেতর থেকে মাথা তুলে তুলে) বেরিয়ে এসে (সাগরের পানিতে ভেসে) তাদের সামনে চলে আসত। আর যখন শনিবার হতো না, তখন (সেগুলো) তাদের সামনে আসত না (বরং সেখান থেকে দূরে সরে যেত)। আর তার কারণ ছিল এই যে, আমি এভাবে তাদের (সুকঠিন) পরীক্ষা করতাম (যে, তাদের মধ্যে কারা নির্দেশে অটল থাকে, আর কারা থাকে না। আর এই পরীক্ষাটির) কারণ (ছিল) এই যে, (তারা পূর্ব থেকে) নির্দেশ অমান্য করে চলত। (সে কারণেই এহেন কঠিন নির্দেশের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করছি। যারা আনুগত্যপরায়ণ, তাদের পরীক্ষা হয় দয়া, সামর্থ্য ও সমর্থন দানে সহজীকৃত।) আর (তখনকার অবস্থা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করুন) যখন তাদের একটি দল (যারা তাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে দিয়ে উপকারিতা ও কার্যকারিতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিল, এমন লোকদের কাছে যারা তখনও সদুপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং ততটা নিরাশও হয়ে পড়েনি—যেমন لعلهم يتقون আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়।) একথা বলল যে, তোমরা কেন এমনসব লোকের সদুপদেশ দিয়ে যাচ্ছ যাদের (কাছ থেকে সে উপদেশ গ্রহণের কোন আশাই নেই এবং তাতে মনে হয়, যেন) আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন অথবা (ধ্বংস যদি নাও করেন, তবু) তাদেরকে (অন্য কোন রকম) কঠিন শাস্তি দেবেন। (অর্থাৎ এহেন মূর্খ, অপদার্থদের নিয়ে কেন খামাখা মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছেন?) তারা উত্তর করল যে, তোমাদের এবং আমাদের পালনকর্তার দরবারে অজুহাত দাঁড় করবার জন্যই (সদুপদেশ দিচ্ছি, যাতে আল্লাহ্র দরবারে বলতে পারি যে, হে আল্লাহ্, আমরা তো বলেই ছিলাম, কিন্তু তারা শোনেনি—আমরা অসহায়।) আর (তদুপরি) এজন্য যে, হয়তো তারা ভীত হয়ে পড়বে (এবং সৎকর্মে প্রবৃত্ত হবে। কিন্তু কবেইবা তারা সৎকাজ করেছিল!) যাহোক, (শেষ পর্যন্ত) যা কিছু তাদেরকে বোঝানো হতো তা থেকে যখন তারা দূরেই

সরে রইল (অর্থাৎ তা পালন করল না), তখন আমি তাদের তো আযাব থেকে রক্ষা করেছি, যারা মন্দ কাজ থেকে বাধা দান করত (চাই সে সময় বাধা দান করে থাক কিংবা নিরাশজনিত অজুহাতে বিরত থেকে থাকুক)। আর যারা (উল্লিখিত নির্দেশের ব্যাপারে) বাড়াবাড়ি করত, তাদেরকে তাদের (অমান্যতার কারণে) এক কঠিন আযাবের মধ্যে পাকড়াও করেছি (অর্থাৎ যখন তারা নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করেছে। এই তো গেল نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهٖ -এর তফসীর) তখন আমি (রাগান্বিত হয়ে) বলে দিয়েছি, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও। (এই হল عَذَابٍ بَئِيسٍ -এর তফসীর।)

উল্লিখিত ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও মা'আরেফুল কোরআনের প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার তফসীরে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٧﴾
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ
بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ
وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۗ
أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾

(১৬৭) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬৮) আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে; তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাল; আর

কিছু অন্য রকম। তাছাড়া আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দের মাধ্যমে যাতে তারা ফিরে আসে। (১৬৯) তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ, যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে কিতাবের; তারা নিকৃষ্ট পার্থিব উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুত এমনি ধরনের উপকরণ যদি আবারো তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও তুলে নেবে। তাদের কাছ থেকে কিতাবে কি অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহ্‌র প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। বস্তুত আখিরাতের আলয় মুত্তাকীদের জন্য উত্তম—তোমরা কি তা বুঝ না!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সে সময়টির কথা স্মরণ করা উচিত, যখন আপনার প্রতিপালক (বনি ইসরাঈলের নবীগণের মাধ্যমে) একথা বাতলে দিয়েছেন যে, তিনি ইহুদীদের উপর (তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার শাস্তি হিসেবে) কিয়ামত (নিকটবর্তী সময়) পর্যন্ত এমন (কোন না কোন) ব্যক্তিকে অবশ্যই চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন (অপমান, লাঞ্ছনা ও পরাধীনতাজনিত) শাস্তি দিতে থাকবে। (সুতরাং সুদীর্ঘকাল যাবত ইহুদীরা কোন না কোন রাষ্ট্রের পরাধীনতা ও কোপানলে ভুগে আসছে।) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আপনার প্রতিপালক সত্যি সত্যিই (যখন ইচ্ছা) যথাশীঘ্র শাস্তি দেন এবং একথাও নিঃসন্দেহে সত্যি (যে, যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তাহলে) তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু (-ও) বটেন এবং আমি তাদেরকে দেশের মধ্যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিই। (অতএব,) তাদের মধ্যে কেউ কেউ সৎ প্রকৃতির (-ও) ছিল—আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল অন্য রকম (অর্থাৎ দুষ্কৃতকারী)। আর আমি (সেই দুষ্কৃতকারীদেরও স্বীয় অনুগ্রহ, অনুশীলন ও সংশোধনের উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে কখনও অসহায় ছেড়ে দিইনি। বরং সব সময়ই) তাদেরকে সচ্ছলতা (অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্য) এবং অসচ্ছলতা (অর্থাৎ ব্যাধি ও দারিদ্র্যের) দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি (এই উদ্দেশ্যে যে,) হয়তো বা (এতেই) তারা ফিরে আসবে। (কারণ, কখনও ভাল অবস্থার মাধ্যমে উৎসাহ দান হয়, আর কখনও মন্দ অবস্থার দ্বারা ভীতি প্রদর্শন হয়ে যায়। এই তো হল তাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা।) অতপর তাদের (অর্থাৎ সেই পূর্বসূরিদের) পরে এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে কিতাব (তওরাত) তো প্রাপ্ত হয়েছে (বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এরা এমনই হারামখোর যে, কিতাবের নির্দেশাবলীর বিনিময়ে) এই নিকৃষ্ট পার্থিব জগতের ধন-সম্পদ (যাই পেয়েছে, তাই নির্দ্বিধায়) নিয়ে নিয়েছে। আর (এরা এতই নির্ভয় যে, এ পাপকে একান্তই ক্ষুদ্র জ্ঞান করে) বলে যে, অবশ্যই আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে। (কারণ, আমরা أبناء الله ও أحباء الله অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র সন্তান এবং প্রিয়জন'। এ

ধরনের পাপ আমাদের মকবুল বান্দাহ্ হওয়ার মুকাবিলায় কোন বিষয়ই নয়।) অথচ (নিজেদের নির্ভীকতা এবং পাপকে হালকা করার ব্যাপারে এরা এতই অটল যে,) তাদের কাছে (আরও) যদি তেমনি (ধর্ম বিক্রির বিনিময়ে) ধন-সম্পদ উপস্থিত হতে থাকে, তবে (নিশঙ্ক চিত্তে) তাও নিয়ে নেবে। (আর পাপকে ক্ষুদ্র মনে করা স্বয়ং কুফর—যার দরুন ক্ষমার কোন সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং এর প্রতি বিশ্বাস রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই পরবর্তীতে ইরশাদ হয়েছে,) তাদের কাছ থেকে কি এ কিতাবের এই বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেয়া হয়নি যে, ন্যায় ও সত্য কথা ছাড়া আল্লাহ্র প্রতি অন্য কোন কথা জুড়ে দিও না। (অর্থাৎ কোন আসমানী গ্রন্থকে যখন মান্য করা হয়, তখন তার মর্ম এই হয় যে, আমরা তার যাবতীয় বিষয়ই মান্য করব।) আর প্রতিজ্ঞাও কোন মোটামুটি বা সংক্ষিপ্ত প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়নি, (যাতে এ সম্ভাবনা থাকতে পারে যে, হয়তো এ বিশেষ বিষয়টি কিতাবে বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে তাদের জানা ছিল না; বরং) একান্ত বিস্তারিত প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে। কাজেই তারা এ কিতাবে যা কিছু (লেখা) ছিল, তা পড়েও নিয়েছে (যার ফলে সে সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়ে গেছে। তথাপি তারা এমন বিরাট বিষয়ের দাবি করে যে, পাপকে ক্ষুদ্র মনে করা সত্ত্বেও পরকালীন মুক্তির ধারণা নিয়ে বসে আছে—যা কিনা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপেরই নামান্তর)। বস্তুত (তারা এসব ব্যাপারই করেছে দুনিয়ার জন্য। রইল (আখিরাতের অবস্থিতি—তাদের জন্য এ পৃথিবী থেকে) উত্তম, যারা (এই বিশ্বাস ও অসৎকর্ম) থেকে বেঁচে থাকে (হে ইহুদীরা) তবুও কি তোমরা (এ বিষয়টি) বুঝতে পার না?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ)-র অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁর উম্মত (ইহুদী)-এর অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। এ আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে সে দু'টি শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে। আর তা হল প্রথমত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে অবশ্য চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদীরা সব সময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জানা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজস্ব কোন ক্ষমতা, না আছে রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একান্ত শত্রুতারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদেরই একটা ঘাঁটি মাত্র। এর চেয়ে বেশী কোন গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদীরা তাদেরই অধীন ও আজ্ঞাবহ। যখনই এতদুভয়

শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে, তখনই ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদীদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যা এই পৃথিবীতেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তা হল এই যে, তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। কোথাও কোন এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا-এর মর্মও তাই। قَطَّعْنَا শব্দটি تَقْطِيعٌ থেকে নির্গত যার অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়া। আর أُمَمٌ হল أُمَّةٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণী। মর্ম হল এই যে, আমি ইহুদী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।

এতে বোঝা গেল যে, কোন জাতি বিশেষের কোন এক স্থানে সমবেত জীবন যাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামত; পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এক রকম ঐশী আযাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র এ নিয়ামত সব সময়ই রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ্ থাকবেও কিয়ামত পর্যন্ত। তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটা সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। মদীনা থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ার বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ এর ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদীরা সব সময়ই বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি।

কয়েক বছর থেকে ফিলিস্তিনের একটি অংশে তাদের সমবেত হওয়া এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোঁকায় পড়া উচিত হবে না। শেষ যমানায় এখানে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ, সদাসত্য রসূল করীম (সা)-এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তাই ঘটবে। শেষ যমানায় ঈসা (আ) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খৃস্টান মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদীদের সাথে জিহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহ্র অপরাধীকে সমন জারী করে এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে হাযির করা হবে না; বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করেন যাতে অপরাধী পায়ে হেঁটে বহু চেষ্টা করে নিজের বধ্যভূমিতে গিয়ে হাযির হবে। হযরত ঈসা (আ)-র অবতরণ ঘটবে সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদীদের সাথে তাঁর যুদ্ধও সেখানে সংঘটিত হবে, যাতে ঈসা (আ)-র পক্ষে তাদেরকে নিধন করে দেওয়া সহজ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে

বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদাজনিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। অতপর শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আ)-র জন্য সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধ্যভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের এই সমবেত হওয়া বর্ণিত আযাবের পরিপন্থী নয়।

রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুত এটা এমন একটা ধোঁকা, যার উপরে বর্তমান যুগের সভ্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর কারুকার্যময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ কোন ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোঁকা খেতে পারে না। কারণ, অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের একটা যৌথ ছাউনির অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যেই বেঁচে আছে এবং এদের বশংবদ থাকার ভেতরেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের রহস্য। বলা বাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে অভিহিত করে দেওয়ায় এ জাতির কোন ক্ষমতালাভ ঘটে না। কোরআনে-করীম তাদের সম্পর্কে কিয়ামতকাল পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনাজনিত যে শাস্তির কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। প্রথম আয়াতটিতে তারই আলোচনা এভাবে করা হয়েছে— وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা যখন সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন এক শক্তিকে চাপিয়ে দেবেন, যা তাদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যেমন, প্রথমে হযরত সোলায়মান (আ)-এর হাতে, পরে বুখতানাসারের দ্বারা এবং অতপর মহানবী (সা)-এর মধ্যমে, আর বাদবাকী হযরত ফারূকে আযমের মাধ্যমে সব জায়গা থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদীদের বহিষ্কার করা একান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হল এই— مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ অর্থাৎ "এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।" "অন্য রকম"-এর মর্ম হল এই যে, কাফির দুষ্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়। কিছু সৎও আছে। এর অর্থ, সেসব লোক, যারা তওরাতের যুগে তওরাতের নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, আর না কোন রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।

এ ছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ঈমান এনেছেন।

অপরাদকে রয়েছে সেই সমস্ত লোক, যারা তওরাতকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহ্কাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের পরকালকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি ভাল-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে। 'ভাল অবস্থার দ্বারা'—এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থা অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সেই অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোন কোন সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। যাই হোক, সারমর্ম হল এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দু'টিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হল দান ও অনুগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যে, তারা দাতা ও অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার ও সম্পাদন করে কিনা? দ্বিতীয়ত তাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন (করে পরীক্ষা) করা হয় যে, তারা নিজেদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের মন্দ ও অসদাচরণ থেকে তওবা করে কিনা।

কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের জন্য নিয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে- اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ হলেন ফকীর আর আমরা ধনী। আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে ঃ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ অর্থাৎ আল্লাহ্র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল যে, কোন জাতির একত্র বাস আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং তার বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হল একটা শাস্তি। দ্বিতীয়ত, পার্থিব আরাম-আয়েশ, আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐশী পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহ্র আনুগত্যের পরীক্ষা নেয়া হয়। এখানকার যে দুঃখ-কষ্ট, তা তেমন একটা হা-হুতাশ বা কান্নাকাটির

বিষয় নয়। তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও অহঙ্কারী হয়ে উঠার মত কোন উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধিমানের জন্য এতদুভয়টিই লক্ষণীয় বিষয়।

نہ شادی دارد سامانے نہ غم آورد نقصانے -
بہ پیش ہمت ما ہر چہ آمد بود مہمانے -

তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ -এর প্রথম শব্দ خَلَفَ (খালাফা) خَلَافٌ ধাতু থেকে নির্গত অতীতকাল বাচক বচন। এর অর্থ—'স্থলাভিষিক্ত কিংবা প্রতিনিধি হয়ে গেল'। আর দ্বিতীয় শব্দ——خَلْفٌ হল ধাতু যা স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একবচন ও বহুবচনে একইভাবে বলা যায়। خَلْفٌ (খালাফুন) লামের সাকিন (বা 'ল'-এর হসন্ত)-যোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অসৎ খলীফা বা প্রতিনিধি অর্থে। যারা কিনা নিজেদের বড়দের রীতিবিরুদ্ধভাবে অপকর্মে লিপ্ত হয়। আর خَلَفٌ (খালাফুন্) লামের ফাতাহ্ (বা 'ল'-এর আকার) যোগে হলে শব্দটি ব্যবহৃত হয় সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধির ক্ষেত্রে। যারা নিজেদের বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে এবং তাদের উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধন করে। এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার তাই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হয়।

وَرِثُوا الْكِتٰبَ শব্দটি وراثت [ওয়ারাসাত] ধাতু থেকে গঠিত। যে বস্তু বা সামগ্রী মৃতের পরে জীবিত ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয়, তাকেই বলা হয় 'মীরাস্' বা 'ওয়ারাসাত'। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তওরাত গ্রন্থখানি নিজেদের বড়দের পক্ষ থেকে তারা প্রাপ্ত হয়েছে কিংবা তাদের মৃত্যুর পর তাদের হাতে এসেছে।

عَرَضٌ (আরাদ) শব্দটি ব্যবহৃত হয় বস্তু-সামগ্রী অর্থে, যা নগদ অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা যায়। আবার কখনও এ শব্দটি সাধারণভাবে বস্তুসামগ্রী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তা নগদ অর্থ হোক বা অন্যান্য সামগ্রী। তফসীরে-মাযহারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, এখানে শব্দটি সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এখানে সাধারণ বস্তু-সামগ্রীকে عَرَضٌ শব্দে উল্লেখ করে এ ইঙ্গিতই করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পদ তা যতই হোক

না কেন, একান্তই অস্থায়ী। কারণ عَرَض (আরাদ) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে মৌল উপাদানের তুলনায় অল্প স্থায়ী বিষয়কে বোঝাবার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়, যার নিজস্ব কোন স্থায়ী অস্তিত্ব থাকে না, বরং সে তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সে কারণেই, عَارِض (আরিদ) শব্দটি 'মেঘ' অর্থে বলা হয়। কারণ, তার অস্তিত্বও স্থিতিশীল নয়। শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কোরআন করীমে এ অর্থেই বলা হয়েছে ঃ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا —

هَٰذَا الْأَدْنَىٰ--তে أَدْنَىٰ শব্দটি 'নৈকট্য' دُنُوٌّ ধাতু থেকে গঠিত বলেও বলা যায়। তখন أَدْنَىٰ (আদনা) অর্থ হবে 'নিকটতর'। এরই স্ত্রী লিঙ্গ হল دُنْيَا (দুন্ইয়া) যার অর্থ নিকটবর্তী। আখিরাতের তুলনায় এ পৃথিবী মানুষের অধিক নিকটে বলেই একে دُنْيَا বা أَدْنَىٰ বলা হয়। এছাড়া 'তুচ্ছ' ও 'হীন' অর্থে ব্যবহৃত دَنَاءَةٌ থেকেও গঠিত হতে পারে। তখন অর্থ হবে হীন ও তুচ্ছ। দুনিয়া এবং তার যাবতীয় বিষয় সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় হীন ও তুচ্ছ বলেই তাকে دُنْيَا ও أَدْنَىٰ বলা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ এই যে, প্রথম যুগের ইহুদীদের মধ্যে দু'রকমের লোক ছিল— কিছু ছিল সৎ এবং তওরাতে বর্ণিত শরীয়তের অনুসারী, আর কিছু ছিল কৃতঘ্ন—পাপী। কিন্তু তারপরে এদের বংশধরদের মধ্যে যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসাবে তওরাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এমনি আচরণ অবলম্বন করেছে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করে দিয়েছে; স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে আল্লাহ্‌র কালামকে তাদের মতলব অনুযায়ী বিকৃত করতে শুরু করেছে।

وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا তদুপরি এই ধৃষ্টতা যে, তারা বলতে থাকে, যদিও আমরা পাপ করে থাকি, কিন্তু আমাদের সে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এহেন বিভ্রান্তি সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে এভাবে সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন— وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ অর্থাৎ তাদের অবস্থা হলো এই যে, এখনও যদি আল্লাহ্‌র কালামের বিকৃতি সাধনের বিনিময়ে এরা কিছু অর্থ লাভ করতে পারে, তাহলে এরা এখনও তা নিয়ে কালামের বিকৃতি সাধনে বিরত থাকবে না। সারার্থ হলো

এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও মার্জনা. যথাস্থানে সত্য ও নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা শুধুমাত্র সেই সব লোকের জন্যই নির্ধারিত, যারা নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে তা পরিহার করার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেবে---যার পারিভাষিক নাম হল 'তওবা'।

এরা নিজেদের অপরাধে অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও মাগফিরাত বা ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করে, অথচ এখনও পয়সা পেলে কালামুল্লার বিকৃতি সাধনে এতটুকু দ্বিধা করবে না। পাপের পুনরাবৃত্তি করেও ক্ষমার আশা করতে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া তার আর কোনই তাৎপর্য থাকতে পারে না।

তারা কি তওরাতে এ প্রতিজ্ঞা করেছিল না যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আরোপ করে এমন কোন কথাই বলবে না, যা সত্য নয়। আর তারা এই প্রতিজ্ঞার বিষয়ে তওরাতে পড়েও ছিল। এসবই হলো তাদের অদূরদর্শিতা। কথা হলো, শেষ বিচারের দিনেই যে পরহিযগারদের জন্য অতি উত্তম ও অন্তহীন সম্পদ রয়েছে তারা কি একথাটিও বুঝে না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾

(১৭০) আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে—নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব। (১৭১) আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে সামিয়ানার মত এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (তাদের মধ্যে) যারা কিতাব (অর্থাৎ তওরাত)-এর অনুবর্তী [যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ঈমান আনারও নির্দেশ রয়েছে---সুতরাং মুসলমান হয়ে যাওয়াটাই অনুবর্তিতা] এবং (বিশ্বাসের সাথে সাথে সৎকর্মের ব্যাপারেও নিষ্ঠাবান---কাজেই) নামাযের অনুবর্তিতা করে। আমি এসব লোকের সওয়াব বিনষ্ট করব না যারা (এভাবে) নিজের সংশোধন করবে। আর সে সময়টিও স্মরণযোগ্য----যখন

আমি পাহাড়কে তুলে নিয়ে ছাদের মত তাদের (অর্থাৎ বনি ইসরাঈলদের) উপরে (সোজাসুজিভাবে) টাঙিয়ে দিই, এবং (তাতে) তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এখনই তাদের উপর পড়ল। অতপর (সে সময়) বলি যে, যে কিতাব আমি তোমাদের দিয়েছি (অর্থাৎ তওরাত, শীঘ্র) কবুল করে নাও (এবং একান্ত) দৃঢ়তার সাথে (কবুল কর)। আর মনে রেখো, যেসব বিধি-বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে, তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগার হয়ে যেতে পারবে। (যদি যথারীতি তার অনুশীলন কর।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষত বনি ইসরাঈলের আলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তওরাত সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে, এতে কোন রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান পরওয়ারদিগারের প্রতি অন্য কোন বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লিখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনি ইসরাঈলের আলিমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তওরাতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য এই আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসেবে বলা হয়েছে যে, বনি ইসরাঈলের সব আলিমই এমন নয়---কোন কোন আলিম এমনও রয়েছে যারা তওরাতের বিধি-বিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে। এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজেরও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাযও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে---আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরয আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমত এই যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য যার আলোচনা ইতিপূর্বে এসে গেছে অর্থাৎ তওরাত। আর এও হতে পারে যে, এতে সমস্ত আসমানী কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন, তওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও কোরআন।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা গেছে যে, আল্লাহ্র কিতাবকে একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্নসহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর অনুবর্তীও হতে হবে। আর এ কারণেই হয়তো এ আয়াতে কিতাবকে গ্রহণ করা কিংবা পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। অন্যথায় يَأْخُذُونَ কিংবা يَقْرَءُونَ শব্দ ব্যবহৃত হত। কিন্তু

এখানে বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ ---যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা অর্থাৎ তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানের অনুশীলন করা।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, এখানে তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছিল আর তওরাতের বিধি-নিষেধ একটি দু'টি, নয় শত শত। সেগুলোর মধ্যে এখানে একটিমাত্র বিধান নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হল নামায। তদুপরি নামাযের অনুবর্তিতা ঐশী বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন। আর এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক নামাযে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়ামানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে লোক নামাযের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়ানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ্ হাদীসে রসূলে করীম (সা)-এর ইরশাদ রয়েছে—"নামায হল দীনের স্তম্ভ, যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।"

সে কারণেই এ আয়াতে وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ-এর পরে وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ বলে এ কথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দৃঢ়তার সাথে কিতাব অবলম্বনকারী এবং তার অনুবর্তী, তাকেই বলা যাবে যে সমুদয় শর্ত মুতাবিক নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায় করে। আর যে নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে, সে যত তসবীহ-ওযীফাই পড়ুক কিংবা যত মুজাহেদা-সাধনাই করুক না কেন আল্লাহ্‌র নিকট সে কিছুই নয়। এমনকি তার যদি কেরামত-কাশফও হয় তবুও তার কোন গুরুত্ব আল্লাহ্‌র কাছে নেই।

এ পর্যন্ত বনি ইসরাঈলদের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি লংঘন এবং তওরাতের বিধি-নিষেধে তাদের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারে তাদের সতর্কীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। এরপর দ্বিতীয় আয়াতে বনি ইসরাঈলেরই একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, যা তওরাতের হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতার জন্য তাদেরকে নানা রকম ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আদায় করে নেয়া হয়েছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারায় এসে গেছে।

এ আয়াতে نَتَقْنَا শব্দটি نَتْقٌ থেকে গঠিত, যার অর্থ হল টেনে নেওয়া এবং

উত্তোলন করা। সূরা বাকারায় এ ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে رَفَعْنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) نَتَقْنَا (নাতাকনা)-এর ব্যাখ্যা (রাফা'না) শব্দের দ্বারাই করেছেন।

رَفَعْنَا আর ظُلَّةٌ শব্দটি ছায়া অর্থে ظِلٌّ (যিল্লুন) থেকে গৃহীত। এর অর্থ সামিয়ানা। কিন্তু প্রচলিত অর্থে এমন বস্তুকেই সামিয়ানা বলা হয়, যার ছায়া মাথার উপর পড়ে, কিন্তু তা কোন খুঁটিতে টাঙ্গানো হয়। আর এ ঘটনায়—তাদের মাথার উপর পাহাড়কে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল—তা সামিয়ানার মতই ছিল না। সেই জন্যই বিষয়টি উদাহরণ-বাচক শব্দসহযোগে বলা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সে সময়টিও স্মরণ করার মত, যখন আমি বনি ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড়কে তুলে এনে টাঙিয়ে দিলাম, যাতে তারা মনে করতে লাগল, এই বুঝি আমাদের উপর পাহাড়টি ছুটে পড়ল! এমনি অবস্থায় তাদেরকে বলা হল—خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ আমি যেসব বিধি-বিধান তোমাদের দান করছি সেগুলোকে সুদৃঢ় হাতে ধর। আর তওরাতের হিদায়েতগুলো মনে রেখো, যাতে তোমরা মন্দ কাজ ও আচরণ হতে বিরত থাকতে পার।

ঘটনাটি হল এই যে, বনি ইসরাঈলদের ইচ্ছা ও অনুরোধের ভিত্তিতে হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কিতাব ও শরীয়তপ্রাপ্তির আবেদন করলেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী এ ব্যাপারে তূর পাহাড়ে চল্লিশ রাত এ'তেকাফ করার পর আল্লাহ্র এ গ্রন্থ পেলেন এবং তা নিয়ে এসে বনি ইসরাঈলদের শোনালেন, তখন তাতে এমন বহু বিধি-বিধান ছিল, যা ছিল তাদের মন-মানসিকতা ও সহজতার পরিপন্থী। সেগুলো শুনে তারা অস্বীকার করতে লাগল যে, আমাদের দ্বারা এসবের উপর আমল করা চলবে না। তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত জিবরাঈলকে হুকুম করলেন এবং তিনি গোটা তূর পাহাড়কে তুলে এনে সেই জনপদের উপর টাঙিয়ে দিলেন যেখানে বনি ইসরাঈলরা বাস করত। এভাবে তারা যখন সাক্ষাত মৃত্যুকে মাথার উপর দাঁড়ানো দেখতে পেল, তখন সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তওরাতের যাবতীয় বিধি-বিধানে যথাযথ আমল করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বারবার তার বিরুদ্ধাচরণই করতে থাকল।

ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃত মর্ম ও কয়েকটি সন্দেহের উত্তর ঃ এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআন মজীদে পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তী বা বাধ্যবাধকতা নেই,

যার ভিত্তিতে কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে সত্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। অথচ আলোচ্য এই ঘটনায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দীন কবুল করার জন্য বনি ইসরাঈলদের বাধ্য করা হয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোন অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে কোথাও কখনও বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে ইসলামী প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অনুবর্তী হয়ে যায় এবং তারপরে সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাহলে অবশ্যই তার উপর জবরদস্তী করা হবে এবং এই বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ইসলামী শাস্তি বিধানে এ ব্যাপারে বহুবিধ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতটির সম্পর্ক হলো অমুসলিমদের সাথে। তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে বা জবরদস্তী মুসলমান বানানো যাবে না। আর বনি ইসরাঈলদের এ ঘটনায় কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয়নি, বরং তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল বলেই তাদের উপর জবরদস্তী আরোপ করে অনুবর্তী করায় لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ-এর পরিপন্থী কিছুই হয়নি।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ
عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَاۗؤُنَا
مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
الْمُبْطِلُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

(১৭২) আর যখন তোমার পালনকর্তা বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, "আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?" তারা বলল, 'অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি।' আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। (১৭৩) অথবা বলতে শুরু কর যে, অংশীদারিত্বের প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী, সন্তান-সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদের ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে। (১৭৪) বস্তুত এভাবে আমি বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (তাদের কাছে তখনকার ঘটনা বর্ণনা করুন,) যখন আপনার পালনকর্তা [আত্মার জগতে আদম (আ)-এর ঔরস থেকে স্বয়ং তার সন্তান-সন্ততিকে এবং] আদম সন্তানদের ঔরস থেকে তাদের সন্তান-সন্ততিকে বের করেছেন এবং (তাদেরকে বোধশক্তি দান করে) তাদের কাছ থেকে নিজের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তোমাদের প্রতিপালক কি আমি নই? সবাই (আল্লাহ্‌র দেওয়া সেই বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত বিষয়টি বুঝে নিয়ে) উত্তর দিল যে, কেন নয়; (নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা সেখানে যত ফেরেশতা ও সৃষ্টি উপস্থিত ছিল সবাইকে সাক্ষী করে, সবার পক্ষ থেকে বললেন,) আমরা সবাই (এ ঘটনার) সাক্ষী হচ্ছি। (বস্তুত এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ও সাক্ষী প্রভৃতি এজন্য হয়েছিল) যাতে তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা তওহীদ পরিহার এবং শিরক গ্রহণের জন্য) কিয়ামতের দিন (শাস্তি পাবে, তারা যেন না) বলতে শুরু করে যে, আমরা তো এই (তওহীদ) সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। অথবা একথা বলতে শুরু কর যে, (আসল) শিরক তো আমাদের বড়রা করেছিল আমরা তো হলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। (আর সাধারণত বংশধরগণ বিশ্বাস ও সংস্কারের ক্ষেত্রে তাদের আসল বা পূর্বপুরুষেরই অনুগামী হয়ে থাকে। কাজেই আমরা এ ব্যাপারে নির্দোষ। সুতরাং আমাদের এ কাজের জন্য আমরা শাস্তিযোগ্য হতে পারি না। যদি তাই হয়, তবে বড়দের কৃতকর্মের জন্য আমাদের পাকড়াও করাই সাব্যস্ত হয়)। বস্তুত এহেন ভুল পন্থা অবলম্বনকারীদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদের ধ্বংসের সম্মুখীন করছেন। [অতএব এই প্রতিজ্ঞা ও সাক্ষী সাব্যস্তের পর তোমরা এই অজুহাত দাঁড় করাতে পার না। অতপর এই প্রতিজ্ঞাকারীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা পৃথিবীতে তোমাদের পয়গম্বরদের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং তাই হয়েছে। যেমন, এখানেও প্রথমে اَنْ اَخَذَ শব্দের তরজমা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, এ বিষয়টি আলোচনার জন্য হযূর (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।] আর (শেষ দিকেও এই স্মারকেরই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে যে,) আমি এভাবেই (নিজের) আয়াতসমূহ পরিষ্কারভাবে বিবৃত করে থাকি (যাতে সেই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তাদের অবগতি লাভ হয়) এবং যাতে (বিষয়টি অবগত হওয়ার পর শিরক প্রভৃতি থেকে) তারা ফিরে আসে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'আলাস্ত'-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিস্তারিত গবেষণা ও বিশ্লেষণঃ এ আয়াতগুলোতে মহাপ্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং দাস ও মনিবের মাঝে সেসময় হয়েছিল, যখন এই দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি আসেওনি যাকে বলা হয় عهد ازل বা عهد الست

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি। আকাশ ও ভূমণ্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যা কিছুই রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভুক্ত। তিনিই এসবের মালিক। না তাঁর উপর কারো কোন বিধান চলতে পারে, আর নাইবা থাকতে পারে তাঁর কোন কাজের উপর কারোও কোন প্রশ্ন করার অধিকার।

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটা নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাঁদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে স্থায়ী সুখ ও শান্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধাচারী তাদের জন্যে রয়েছে সব রকমের আযাব ও শাস্তি।

তাছাড়া বিরুদ্ধাচরণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর নিজস্ব সর্বব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কাজ-কর্ম; এমনকি মনের গোপন ইচ্ছা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোন পরিদর্শক নিয়োগ করা, আমলনামা তৈরী করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেওয়া এবং সেজন্য সাক্ষী-সাবুদ দাঁড় করানোর কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

কিন্তু তিনিই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের দরুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোন লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে লিখিত-পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ তার সামনে এমনভাবে এসে যায় যেন সে নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নেয় এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে।

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য লেখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থাৎ এমন কোন বাক্য মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরিদর্শক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়নি। আরো বলা হয়েছে ঃ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ লিখিত রয়েছে।

অতপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করে মানুষের সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেওয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে আযাবে ধরা পড়বে।

এছাড়া মহাবিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন প্রত্যেকের কাজ-কর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কোন কোন অপরাধী সাক্ষীদের মিথ্যা বলে দাবি করবে, তখন তারই হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে সত্য-সঠিক ঘটনা বাতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোন সুযোগই থাকবে না। তারা স্বীকার করবে—

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ

মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের মত নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু তাদেরকে দিয়ে দেননি বরং আইনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন।

একজন অনন্যসাধারণ স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি তৈরী করেন যে, যে-ই এর বিরুদ্ধাচরণ করবে সে-ই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার (পিতার) স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয়ে বরং সবাই যেন সেই নিয়ম-পদ্ধতি মুতাবিক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকাল বেলা স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি করার জন্য সময়ের আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত মাতা-পিতার দয়া ও করুণার চেয়ে বহু গুণ বেশি। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু আইন-কানুন ও শাস্তিবিধি হিসেবেই তৈরী করে দেননি; বরং একটি নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমনসব নিয়ম-পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

ঐশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সাথে পাঠিয়েছেন আসমানী নির্দেশনামা। এক বিরাটসংখ্যক ফেরেশতাকে সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সৎকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

এই ঐশী ব্যবস্থারই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান প্রতিপালককে স্মরণ করার জন্য—বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করে দেওয়া, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন

এবং স্বয়ং মানুষের নিজস্ব পরিমণ্ডলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত এমনসব নির্দেশ স্থাপন করে দেওয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বন করা যায়, তাহলে কোন সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছেঃ وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ যারা দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে)। তারপরেও কি তোমরা দেখছ না?

তাছাড়া যারা গাফিল, তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সৎকাজে নিয়োজিত করার জন্য রাব্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থা এও করেছেন যে, ব্যক্তি, দল ও জাতি-সমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় নবী-রসূলদের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞাপ্রতি-শ্রুতি আদায় করে তাদেরকে আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কোরআন মজীদের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলো-চনা করা হয়েছে যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রসূলদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিসালাতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌঁছে দেন। এতে যেন কারো ভয়ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কোন আশংকাই তাঁদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহ্র এই পবিত্র দল নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রিসালতের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সবকিছু কোরবান করে দিয়েছেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক রসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজ নিজ নবী-রসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে। তারপর প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য—যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ পূরণ করেনি।

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতিটি, যা আমাদের রসূল মকবুল (সা) সম্পর্কে সমস্ত নবী-রসূলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে যে, তাঁর 'নবীয়ে-উম্মী' খাতামুল আম্বিয়া (সা)-র অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করবেন যার আলোচনা নিম্নের আয়াতে করা হয়েছেঃ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ

এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিই হল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরিপূর্ণ রহমতের বিকাশ। এগুলোর উদ্দেশ্য হল এই যে, মানুষ যারা অত্যন্ত মনভোলা, প্রায়ই যারা নিজেদের কর্তব্য কর্ম ভুলে যায়, তাদেরকে বারবার এসব প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া, যাতে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।

বায়'আত গ্রহণের তাৎপর্য ঃ নবী-রসূল এবং তাঁদের প্রতিনিধি ওলামা ও মাশায়েখ-দের মাঝে বায়'আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তাও এই ঐশী রীতিরই অনুসরণ। স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-ও বিভিন্ন ব্যাপারে সাহাবী (রা)-দের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। সেসব বায়'আতের মধ্যে 'বায়'আতে রিদওয়ান'-এর কথা কোরআন করীমে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বিশেষ গাছের নিচে আপনার হাতে 'বায়'আত' নিয়েছেন।

হিজরতের পূর্বে মদীনার আনসারদের বায়'আতে 'আকাবা-'ও এমনি ধরনের প্রতি-শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

বহু সাহাবীর কাছ থেকে ঈমান ও সৎকর্মে নিষ্ঠার ব্যাপারে বায়'আত নেওয়া হয়েছে। মুসলমান সূফী সম্প্রদায়ে যে বায়'আত প্রচলিত রয়েছে, তাও ঈমান ও সৎকর্মে নিয়মানু-বর্তিতা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকারই আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ ও নবী-রসূলদের সে রীতিরই অনুসরণ। আর সে কারণেই এতে বিশেষ বরকত রয়েছে। এতে মানুষ পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী যথাযথ পালনের সৎসাহস ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। বায়'আতের তাৎপর্য জানার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বর্তমানে যে ধরনের বায়'আত সাধারণভাবে অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কোন বুযুর্গের হাতে হাত রেখে দেয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে ধারণা করা হয়—তা সম্পূর্ণই মূর্খতা। বায়'আত হল একটি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির নাম। তখনই এর উপকারিতা লাভ হবে, যখন এ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। না হলে এতে মহাবিপদের আশঙ্কা।

সূরা আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোতে সে প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা বনি ইসরাঈলদের কাছ থেকে তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টি লগ্নে নেওয়া হয়েছিল। যা সাধারণ ভাষায় عَهْدِ اَلَسْتُ (আহদে-আলাস্ত) বলে প্রসিদ্ধ।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ

এ আয়াতগুলোতে আদম সন্তানদের বোঝাবার জন্য ذُرِّيَّتٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্‌ফাহানী বলেন যে, এ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ذرء (যরউন্) থেকে গঠিত। যার অর্থ সৃষ্টি করা। কোরআন করীমে কয়েক জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا প্রভৃতি। কাজেই 'যুররিয়্যাৎ'-এর শাব্দিক তরজমা হল সৃষ্টি। এ শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রতিশ্রুতি সে সমস্ত মানুষেই ব্যাপক ও প্রসারিত যারা আদম (আ)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে।

হাদীসের রেওয়ায়েতে এই আদি প্রতিশ্রুতির আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যথা ঃ

ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম আহমদ (র) মুসলিম ইবনে ইয়াসারের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, কিছু লোক হযরত ফারুক আ'যম (রা)-এর কাছে এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁর কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তা হল এই ঃ

> "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের কুদরতের হাত যখন তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর ঔরসে যত সৎ মানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁর পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত পাপী-তাপী মানুষ তাঁর ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দোযখে যাবার মতই কাজ করবে। সাহাবীদের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! প্রথমেই যখন জান্নাতী ও দোযখী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্যে?' হুযূর (সা) বললেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাত-বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ্ যখন কাউকে দোযখের জন্য তৈরি করেন, তখন সে দোযখের কাজই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।"

অর্থাৎ মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ (র)-এর রেওয়ায়েতে এ বিষয়টিই হযরত আবুদ্দার্দা (রা)-র উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা আদম (আ)-এর ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ---যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ---যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে।

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মত যত আদম সন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল।

এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুররিয়াত'-এর আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ কোরআনের শব্দে 'বনি-আদম' অর্থাৎ আদম সন্তানের ঔরসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, আদম (আ)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে, যারা সরাসরি আদম (আ)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যদের। এভাবে যে ধারায় এ পৃথিবীতে আদম সন্তানেরা জন্মাবার ছিল, সে ধারায়ই তাদেরকে পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার অর্থও এই যে, আদম থেকে তাঁর সন্তানদের, অতপর এই সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদের আনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়।

কোরআন মজীদে সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই আদম-সন্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমন্বয় ছিল যা শরীরের সূক্ষ্মতর অণু-পরমাণুর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। কারণ, প্রতিপালক, বিদ্যমানতা এবং লালন-পালনের প্রয়োজন বেশির ভাগ সেই ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ঘটে এবং যাকে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কাল বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দীপ্তির বর্ণনা রয়েছে, তাতেও বোঝা যায় যে, সেগুলো শুধু অশরীরী আত্মাই ছিল না। রূহ্ বা আত্মার কোন রং বা বর্ণ নেই; শরীরের সাথেই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

এতেও বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জন্মাবার যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল? কারণ, হযরত আবুদ্দার্দা

(রা)-র বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েও বিশ্লেষণ রয়ে গেছে যে, তখন যে আদম সন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না, যা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসবে। বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মত। তাছাড়া বিজ্ঞানে বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোন সমঝদার লোকের মনে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নেরই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় আকার-অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটা পিঁপড়ার আকৃতিতে কেমন করে বিকাশ লাভ করল। ইদানীং তো একটি অণুর ভেতরে গোটা সৌরমণ্ডলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বড়র চেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা যদি এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় সমস্ত আদম সন্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তা আর তেমন কঠিন হবে কেন?

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এই আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত, এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেওয়া হয় যে, তখন একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোন মানুষের জন্মই হয়নি, তখন তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কেমন করে হল, যাতে তারা আল্লাহ্কে চিনতে পারবে এবং তার প্রতিপালক হওয়ার কথা স্বীকার করবে? কারণ প্রতিপালকের কথা সে-ই স্বীকার করতে পারে, যে প্রতিপালক সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষান্তরে এই প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল—এ সম্পর্কে মুফাস্সিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (র) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তা হল এই যে, এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেওয়া হয়, যখন আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হল, 'ওয়াদিয়ে নু'মান'—যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেছে। ---তফসীরে-মাযহারী

থাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এই নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোন স্রষ্টা ও প্রতিপালক রয়েছেন? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে। —এর উত্তর হল এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অণুর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তখন প্রয়োজনানুপাতে তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি দেওয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে হয়েও ছিল তাই। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জ্ঞানানুভূতি।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও কুদরতের এমন সব অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে যে লোক সামান্যও লক্ষ্য করবে, সে আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে গাফিল থাকতে পারে না। কোরআনে রয়েছেঃ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ - অর্থাৎ বিজ্ঞজনদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে), তবুও কি তোমরা দেখছ না?

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি (আহ্দে আলাস্তে) যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হোক না কেন, কিন্তু এ কথাটি তো অন্তত সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি কারোরই স্মরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হল?

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদম সন্তানদের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন যারা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্নুন মিসরী (র) বলেছেন, এই প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেন এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার আশেপাশে কারা কারা উপস্থিত ছিল সে কথাও আমার স্মরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন লোকের সংখ্যা একান্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বোঝার বিষয় হল এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্ট্যগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা কারো স্মরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে আল্লাহ্-পরিচিতির একটা বীজ রোপণ করে দিয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে লালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জানা থাক কিংবা না থাক। আর এই বীজেরই ফুল-ফসল এই যে, প্রত্যেকটি মানুষের মনেই ঐশী প্রেম ও মহত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে—তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা এবং সৃষ্টি-পূজার কোন ভ্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনভাবে। সেই কতিপয় হতভাগ্য, যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত-মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহ্র ধ্যান, তাঁর কল্পনা ও মহিমান্বিত অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা-বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোন গোমরাহ্ ও ভ্রষ্ট সমাজ-পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে عَلَى هٰذِهِ الْمِلَّةِ (বুখারী, মুসলিম) অর্থাৎ প্রতিটি সন্তান স্বভাবধর্ম অর্থাৎ ইসলামের উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতামাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত করে দেয়। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন যে, আমি আমার বান্দাদের 'হানীফ' অর্থাৎ এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসীরূপে সৃষ্টি করেছি। অতপর শয়তান তাদের পেছনে লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা রয়েছে যা এ পৃথিবীতে ও নবী-রসূল (সা)-এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, স্মরণ রাখুক বা না রাখুক, সেগুলো কিন্তু যে-কোন অবস্থাতেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে।

উদাহরণত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামত ও তকবীর বলার যে সুন্নতটি সব মুসলমানই জানে এবং (আলহামদু-লিল্লাহ্) সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে—যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার পর স্মরণও থাকে না যে, তার কানে কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তা হল এই যে, এতে করে সেই আদি প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, কিন্তু নিজকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একান্তই খারাপ মনে করে। এমনিভাবে যারা কোরআনের ভাষা জানে তাদের প্রতিও কোরআন তিলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয়তো এই যে, এতে করে অন্তত এই গোপন উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব হয়।

সে জন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ অর্থাৎ এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অন্তরে ঈমানের

মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোন অব্যাহতি থাকবে না।

অতপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ অর্থাৎ এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কিয়ামতের দিন এমন কোন ওযর-আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাঁটি-অখাঁটি, ভুল-শুদ্ধ কোনটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে আমরাও তাই গ্রহণ করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে কেন? আল্লাহ্ তা'আলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক জ্ঞান ও দর্শনের বীজ রোপণ করে দেয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কোন কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আগুন, পানি, বৃক্ষ অথবা কোন মানুষ প্রভৃতির কোন একটিও এমন নয়, যাকে কোন মানুষ নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ অর্থাৎ আমি এমনিভাবে আমার নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যদি কেউ সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই আদি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছিল। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করবে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ

أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ إِن
تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾
سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

(১৭৫) আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সেই লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। (১৭৬) অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। (১৭৭) তাদের উদাহরণ অতি নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদেরকে (শিক্ষা গ্রহণের জন্য) সে ব্যক্তির অবস্থা পড়ে শোনান যাকে আমি নিজের নিদর্শন দান করেছি (অর্থাৎ বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান দিয়েছি) তারপর সে সেসব (নিদর্শন) থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেছে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগেছে। বস্তুত সে পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে তাকে সে নিদর্শনসমূহের (চাহিদা অনুযায়ী আমল করার) বদৌলতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম। (অর্থাৎ সে যদি সে সমস্ত আয়াতের উপর আমল করত যেগুলো নিয়তি ও ভাগ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিষয়টি সর্বজনবিদিত, তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যেত।) কিন্তু সে তো পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে এবং (এ আকর্ষণের দরুন) নিজের রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে (এবং আয়াত ও নিদর্শনসমূহের উপর আমল করা পরিহার করেছে)। সুতরাং (আয়াতসমূহ বর্জন করে যে পেরেশানী ও লাঞ্ছনা তার ভাগ্যে জুটেছে সে অনুযায়ী) তার অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেছে যে, তুমি যদি তাকে তাড়া কর (এবং মেরে বের করে দাও) তবুও হাঁপাবে কিংবা তাকে (যদি সে অবস্থাতেই) ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। (কোন অবস্থাতেই তার স্বস্তি নেই। এমনি করে এ লোক লাঞ্ছনার

দিক দিয়ে তো কুকুরসদৃশ আছেই, পেরেশানী এবং অস্থিরতায়ও কুকুরের সে গুণেরই অংশীদার হয়েছে। সুতরাং তার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে (এমনি অবস্থা সেসব লোকেরও যারা আমার আয়াতসমূহকে (যা তওহীদ ও রিসালতের নিদর্শনস্বরূপ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (সত্য-সনাতন বিষয়ের বিকাশের পর শুধুমাত্র কামনা-বাসনার তাড়নায় সত্যকে বর্জন করছে।) কাজেই আপনি এই অবস্থাটি বলে দিন, হয়তো এসব লোক (তা শুনে) কিছুটা ভাববে। (প্রকৃতপক্ষে) তাদের অবস্থাও (একান্তই) মন্দ, যারা আমার (তওহীদ ও রিসালত প্রমাণকারী) আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর (মিথ্যারোপের কারণে) তারা নিজেদের (-ই) ক্ষতিসাধন করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে বনি ইসরাঈলের জনৈক বড় আলিম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছার পর সহসা গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি নিদর্শনমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ বিবৃত করা হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা আদি লগ্নে সমস্ত আদম-সন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহুদী-নাসারা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতি-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন, ইহুদীরা---খাতিমুন্নাবিয়্যীন (সা)-এর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আকার-অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং তিনি যে সত্য নবী তাও প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী (সা)-র আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বিরত থাকে।

বনি-ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পথভ্রষ্টতার নিদর্শনমূলক ঘটনা ঃ এ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা পড়ে শুনিয়ে দিন, যাতে বনি ইসরাঈলের একজন বিরাট আলিম ও আরেফ এবং প্রখ্যাত নেতার এমনি উত্থানের পর পতন ও হিদায়েতের পর গোমরাহীর কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মা'রেফাত হাসিল করার পর, যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান-গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপ-মানের সম্মুখীন হতে হল।

কোরআন মজীদে সে লোকের নাম বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তফসীরবিশারদ, সাহাবী ও তাবেঈনদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলিমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হযরত ইবনে মারদুইয়াহ্ (র) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বাল্'আম ইবনে বাউ'রা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেন্আনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহ্র কোন কোন কিতাবের ইলম তার ছিল। তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআন করীমে যে اَلَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا বলা হয়েছে, তাতে সে ইলমের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ফিরাউনের জলমগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর তখন হযরত মূসা (আ) ও বনি-ইসরাঈলদের 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম হল এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, মূসা (আ) সমগ্র বনি ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌঁছে গেছেন ---পক্ষান্তরে তাদের মুকাবিলায় ফিরাউন সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তখন তাদের ভয় হল। তারা সবাই মিলে বাল্'আম ইবনে বাউ'রার কাছে সমবেত হয়ে বলল, মূসা (আ) অতি কঠিন লোক, তদুপরি তাঁর সাথে সৈন্যও বিপুল---তারা এসেছে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মুকাবিলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বাল্'আম ইবনে বাউ'রা ইস্মে আ'যম জানত এবং সেই ইস্মের মাধ্যমে যে দোয়া করত তাই কবুল হত।

বাল্'আম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা এ কি বলছ! তিনি হলেন আল্লাহ্র নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহ্র ফেরেশতা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদ-দোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহ্র দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি! আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া-আখিরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

জাব্বারীনরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বাল্'আম বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি আমার প্রতিপালকের নিকট জেনে নেই এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা। সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য ইস্তেখারা কিংবা অন্য কোন আমল করল। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে বলে দেওয়া হল, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রদায়কে বলল যে, বদ-দোয়া করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় তাকে একটা বিরাট উপঢৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচ বিশেষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি এ কাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ

গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে মূসা (আ) এবং বনি ইসরাঈল-দের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহূর্তে আল্লাহ্‌র মহা কুদরতের এক আশ্চর্য বিস্ময় দেখা দেয়---মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চীৎকার করে উঠল---তুমি যে আমাদের জন্যই বদ-দোয়া করছ। বাল'আম বলল, এটা আমার ইচ্ছা-কৃত নয়---আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়।

ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাযিল হল। আর বাল'আমের শাস্তি হল এই যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে দুনিয়া-আখিরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। তবে আমি তোমাদের একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা মূসা (আ)-র বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

তা হল এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদের সাজিয়ে বনি ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে, বনি ইসরাঈলদের লোকেরা তাদের সাথে যা-ই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোন রকম বাধ যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয়তো বা এরা এ ব্যবস্থায় হারামকারীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্‌র নিকট হারাম-কারী অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, অবশ্য তাতে গযব ও অভিসম্পাত নাযিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না।

বাল'আমের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হল এবং সেমতেই কাজ করা হল। বনি ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। কিন্তু সে বিরত হল না; বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনি ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হল। এমনকি যে লোক অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনি ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখল যাতে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে, প্লেগ দমিত হল।

কোরআন মজীদে উল্লিখিত এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, فَانْسَلَخَ مِنْهَا অর্থাৎ আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান-পরিচয় সে লোককে দান করেছিলাম,

কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। اِنْسَلَخَ (ইন্‌সেলাখুন্) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভেতর থেকে কিংবা সাপের ছলমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানেও আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে পড়েছে। فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ (শয়তান তার পেছনে লেগে গেছে।) অর্থাৎ যে পর্যন্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত তার উপর শয়তান কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্তু যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল। فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (অতপর সে হয়ে গেল গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত)। অর্থাৎ শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে اَخْلَدَ শব্দটি اِخْلَادٌ ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে, যার অর্থ হল কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোন স্থানকে আঁকড়ে ধরা। আর اَرْضٌ--এর প্রকৃত অর্থ হল ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যা কিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, আর না হয় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাখো-কোটি বস্তু-সমগ্রী, যার উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েশ নির্ভরশীল। সুতরাং " ارض " (আরদ) শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হল প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

এই বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ--فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

لَهَثَ—اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল জিহ্বা বের করে জোরে শ্বাস নেওয়া।

প্রতিটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভিতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার মাধ্যমে ভিতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহ্ তা'আলাও প্রতিটি জীবের জন্য এ কাজটি এতই সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোন ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের রন্ধ্র দিয়ে ভিতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভিতরে আসা-যাওয়া করছে। এতে না কোন শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে।

জীব-জন্তুর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব, যাকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে জিহ্বা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোন বিপদের সম্মুখীন হয়।

কোরআন করীম সে ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার কারণ আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল! তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মত হাঁপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করুক আর না-ই করুক, সে যে কোন অবস্থায় শুধু হাঁপাতেই থাকত।

অতপর ইরশাদ হয়েছে ঃ—ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

অর্থাৎ এই হলো সে সমস্ত জাতির উদাহরণ, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এর মর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, এরাই হল সেই সমস্ত মক্কাবাসী, যারা কোন একজন পথপ্রদর্শকের আগমন কামনা করত, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাবেন এবং আনুগত্যের সঠিক পন্থা বাতলে দেবেন। কিন্তু যখন সেই পথপ্রদর্শক আগমন করলেন এবং এমন সব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে এলেন যাতে তাঁর সত্যতা ও সঠিকতার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশও থাকতে পারে না, তখন তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অমান্য করতে থাকে।

কোন কোন তফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, এতে উদ্দেশ্য হল, বনি ইসরাঈল, যারা মহানবী (সা)-র আবির্ভাবের প্রাক্কালে তাঁর নিদর্শন ও লক্ষণাদি এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তওরাতে পাঠ করে মানুষকে বলত এবং তারা নিজেরাও তাঁর আগমন

প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তাঁর আগমনের পর তারাই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা ও শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয় এবং তওরাতের বিধি-বিধান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যায়, যেমন করে বেরিয়ে গিয়েছিল বাল'আম ইবনে বাউরা।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ-

অর্থাৎ আপনি সেসমস্ত লোকদের কাহিনী তাদেরকে শুনিয়ে দিন। হয়তো তাতে তারা কিছুটা চিন্তা করবে এবং এ ঘটনার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে—আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের অবস্থা একান্তই নিকৃষ্ট। আর এসব লোক নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করছে; অন্য কারোই কিছু অনিষ্ট করছে না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং তাতে বিবৃত ঘটনায় চিন্তাশীলদের জন্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

প্রথমত কারো পক্ষে নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং ইবাদত-উপাসনার ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরী হয় না। যেমন হয়েছিল বাল'আম ইবনে বাউরার পরিণতি। ইবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত এমন সব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, বিশেষ করে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়ত অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কারণ ভ্রান্ত লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই বাল'আম ইবনে বাউরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

চতুর্থত অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হল নিজ জাতিকে যথাশক্তি অশ্লীলতার প্রকোপ হতে বিরত রাখা। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলার আযাবকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চমত আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করলে মানুষ আযাবে পতিত হয় এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ্ তা'আলা দীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ
لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ
بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۭ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ
اَضَلُّ ۭ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

(১৭৮) যাকে আল্লাহ্ পথ দেখাবেন, সে-ই পথপ্রাপ্ত হবে। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (১৭৯) আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে. তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফিল শৈথিল্যপরায়ণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়েত করেন, সে-ই হয় হিদায়েতপ্রাপ্ত। (পক্ষান্তরে) যাকে পথভ্রষ্ট করেন সে লোকই হয় (অনন্ত) ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন। (এরপরে তাদের কাছ থেকে হিদায়েতের আশা করা কিংবা তাদের হিদায়েত না হওয়ার কারণে দুঃখিত হওয়ার কোন অর্থ নেই।) আর (তারা যখন নিজেদের ধারণক্ষমতাকে কাজে লাগাতে রাযী নয়, তখন হিদায়েতপ্রাপ্ত হবেই বা কেমন করে? কাজেই তাদের ভাগ্যে তো দোযখই থাকবে।) আমি এমন বহু জিন ও মানুষকে দোযখের জন্যই (অর্থাৎ সেখানে অবস্থানের জন্যই) তৈরি করেছি। তাদের অন্তর (রয়েছে বটে, কিন্তু তা) এমন, যার দ্বারা (সত্য কথাকে) উপলব্ধি করে না। (কারণ, তারা তার ইচ্ছাই করে না।) আর তাদের (নামে মাত্র) চোখ রয়েছে (কিন্তু তা) এমন, যাতে (প্রামাণ্য দৃষ্টিতে কোন বস্তুকে) দেখতে পারে না এবং তাদের (নামে মাত্র) কান রয়েছে (কিন্তু তা এমন) যাতে (নিবিষ্টতার সাথে কোন সত্য কথা) শোনে না। (বস্তুত) এরা (আখিরাত সম্পর্কে অমনোযোগিতার দিক দিয়ে) চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং (যেহেতু চতুষ্পদ জীব-জন্তুকে আখিরাতের প্রতি লক্ষ্য করার জন্য আদেশ করা হয়নি, কাজেই তাদের সেদিকে লক্ষ্য না করা কোন অন্যায় নয়, কিন্তু এ সমস্ত লোককে আখিরাতের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলা সত্ত্বেও অনীহা প্রদর্শন করে। এই হিসাবে (তারা চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও বেশি পথভ্রষ্ট। (কারণ,) এসব লোক (আখিরাতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেওয়া সত্ত্বেও) গাফিল হয়ে আছে (পক্ষান্তরে চতুষ্পদ জন্তুর অবস্থা তেমন নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু হল এই যে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক পথের হিদায়েত দান করেন, সে-ই হল হিদায়েতপ্রাপ্ত। আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন সে হল ক্ষতিগ্রস্ত।

এ বিষয়টি কোরআন মজীদের বহু আয়াতে বার বার আলোচিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হিদায়েত ও গোমরাহী, কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ভাল ও মন্দের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। তিনি মানুষের সামনে ভাল-মন্দ কিংবা সঠিক ও বেঠিক উভয় পথই মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বিশেষ এক ক্ষমতাও দিয়ে দিয়েছেন। সে তার এই ক্ষমতাকে যদি ভাল ও সঠিক পথে ব্যয় করে, তবে পুণ্য ও জান্নাতের অধিকারী হবে, মন্দও বেঠিক পথে ব্যয় করলে আযাব ও জাহান্নাম হবে তার বাসস্থান।

এ ক্ষেত্রে একথাটিও লক্ষণীয় যে, হিদায়েতপ্রাপ্তদের একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যারা পথভ্রষ্ট-গোমরাহ, তাদের উল্লেখ করা হয়েছে বহুবচনে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হিদায়েতের পথ শুধুমাত্র একটি। তা'হল সত্য-দীন, যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে খাতেমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সমস্ত নবী-রসূল (আ)-এরই পথ ছিল। সবার মূলনীতিই এক ও অভিন্ন। কাজেই যারা সত্যনিষ্ঠ তারা যে যুগেই হোক না কেন, যে নবীরই উম্মত হোক না কেন এবং যে আসমানী ধর্ম কিংবা দীনেরই অনুসারী হোক না কেন, সবাই মূলত এক এবং একই ধর্মের অনুসারী বলে গণ্য।

পক্ষান্তরে পথভ্রষ্টতার জন্য রয়েছে হাজারো ভিন্ন ভিন্ন পন্থা। সেজন্যই পথ-ভ্রষ্টদের উল্লেখ প্রসঙ্গে বহুবচন ব্যবহার করে বলা হয়েছে ঃ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

এ আয়াতে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যারা গোমরাহী অবলম্বন করে, তাদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে যারা হিদায়েতপ্রাপ্ত তাদের জন্য কোন বিশেষ দান-প্রতিদানের কথা বলা হয়নি; বরং এতটুকু বলেই যথেষ্ট করা হয়েছে যে, তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হিদায়েতই এমন এক মহান নিয়ামত যা দীন-দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামত ও রহ্মতকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। এ পৃথিবীতে সৎজীবন এবং আখিরাতে জান্নাত প্রাপ্তির মত নিয়ামতসমূহও হিদায়েতের সাথেই সম্পৃক্ত। এ দিক দিয়ে হিদায়েত নিজেই এক বিরাট নিয়ামত ও মহা দান—যার পরে অন্যান্য নিয়ামত পৃথকভাবে গণনা করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না, যা হিদায়েতের প্রতিদানে পাওয়া যাবে। এর উদাহরণ অনেকটা এমন—কোন বিরাট রাজ্য ও রাজক্ষমতার অধিকারী কোন লোককে যেন বলে দিলেন যে, তুমি আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ লোক। আমরা তোমার কথা শুনব

এবং মানব। এমতাবস্থায় যে কোন লোক বুঝতে পারে যে, এর চেয়ে বড় কোন পদমর্যাদা কিংবা কোন সম্পদই সে লোকের জন্য আর থাকতে পারে না।

তেমনিভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যদি কাউকে হিদায়েতপ্রাপ্ত বলে আখ্যায়িত করেন, তবে সে দীন-দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের অধিকারী হয়ে যায়। সেজন্য পরবর্তী মনীষীরা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-উপাসনা নিজেই তার প্রতিদান এবং বৃহত্তর দান। যে লোক আল্লাহ্র যিকিরে নিয়োজিত থাকে, সে তখনই আল্লাহ্র দান নগদে পেয়ে যায়। তদুপরি তার জন্য পরকালে নির্ধারিত থাকে জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামত। এতেই কোরআন মজীদের এ আয়াতের মর্ম বোঝা যায়, যাতে বলা হয়েছে ঃ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً এতে একই বস্তুকে প্রতিদান ও দান দুই-ই বলা হয়েছে, অথচ এ দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। প্রতিদান হয় কোন কিছুর বিনিময়ে, আর দান হয় বিনিময় ছাড়া।

এতে দান ও প্রতিদানের তাৎপর্য বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে প্রতিদান এবং কোন কর্মের বিনিময় বলে ভাবছ, প্রকৃতপক্ষে তাও আমারই দান ও উপহার। কারণ তোমরা যে কর্মের বিনিময়ে এই প্রতিদান লাভ করলে সে কাজটি নিজেই ছিল আমার দান।

দ্বিতীয় আয়াতেও এ বিষয়টিরই অধিকতর বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, হিদায়েত ও পথভ্রষ্টতা উভয়টিই আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। তিনি যাকে হিদায়েত দিতে চান, সে হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়। যেসব কাজ সে করে তা সবই হিদায়েতের চাহিদা অনুযায়ী সংঘটিত হয়।—

خود چوں دفتر تلقین کشاید
زمن آں دروجود آید کہ باید

বস্তুত যে লোক পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়, তার সব কাজই সেমত হতে থাকে।

কাজেই বলা হয়েছে ঃ— وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا অর্থাৎ আমি অনেক জিন ও মানুষ তৈরি করেছি জাহান্নামের জন্য, যাদের লক্ষণ হল এই যে, উপলব্ধি করার জন্য তাদের অন্তর

রয়েছে, দেখার জন্য রয়েছে চোখ এবং শোনার জন্য রয়েছে কান; এক কথায় সবই তাদের রয়েছে; সেগুলোর সদ্ব্যবহার করলে সরল-সঠিক পথ পেতে পারে এবং মঙ্গলামঙ্গল ও লাভ-ক্ষতি সবই বুঝতে পারে। কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, তারা না অন্তর দিয়ে কোন বিষয়কে উপলব্ধি করে, না চোখের দ্বারা কোন কিছু দেখে; আর নাই-বা কানের দ্বারা কোন কিছু শোনে।

এতে প্রসঙ্গক্রমে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর বা নিয়তি যদিও অতি গোপন রহস্য এবং যদিও কেউ এ পৃথিবীতে তা জানতে পারে না কিন্তু লক্ষণাদির দ্বারা তার কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। যারা জাহান্নামবাসী তাদের লক্ষণ হলো এই যে, তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্যকে সঠিক কাজে ব্যয় করবে না, সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যে বুদ্ধি-বিবেচনা ও চোখ-কান দিয়েছেন, সেগুলোকে তারা যথাস্থানে ব্যবহার করে না এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য যার দ্বারা অশেষ ও চিরস্থায়ী, আনন্দ ও সম্পদ অর্জিত হতে পারে সেদিকে মনো-নিবেশ করে না।

কাফিরদের না বোঝা, না দেখা ও না শোনার তাৎপর্য ঃ এ আয়াতে সেসব লোকের বোঝা, দেখা ও শোনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা কিছুই বোঝে না, কোন কিছু দেখেও না এবং শোনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উন্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারে না। অন্ধও নয় যে, কোন কিছু দেখবে না কিংবা কালাও নয় যে, কোন কিছু শোনবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর।

কিন্তু কথা হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টিসমূহের মধ্যে প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজন অনুপাতে তার জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধি ও উপলব্ধি ক্ষমতা দান করে-ছেন। যেসব জিনিসকে আমরা বুদ্ধি বিবর্জিত ও অনুভূতিহীন বলে মনে করি, প্রকৃত-পক্ষে সেগুলোও জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি বিবর্জিত নয়। অবশ্য এসব বিষয় সেগুলোর মাঝে সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে যেটুকু তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বাস্ত-বায়নের জন্য যথেষ্ট। সবচেয়ে কম বুদ্ধি ও চেতনা-উপলব্ধি রয়েছে মাটি, পাথর প্রভৃতি জড় পদার্থের মাঝে যাদের না আছে প্রবৃদ্ধি, না স্বস্থান থেকে কোথাও যাওয়া কিংবা চলাফেরার প্রয়োজন। কাজেই এতে সেই শক্তি-সামর্থ্য এতই ক্ষীণ যে, তাদের জীবনীশক্তির আন্দাজ করাও কঠিন। এগুলোর চাইতে সামান্য বেশি রয়েছে উদ্ভিদদের মধ্যে, যার অস্তিত্বের লক্ষ্যের মাঝে প্রবৃদ্ধি এবং ফল দান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে বুদ্ধি-উপলব্ধিও সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে। তারপর আসে পশুর নম্বর; যাদের জীবনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবর্ধন ও চলাফেরা করে খাবার আহরণ করা, ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা, আর বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে যে বুদ্ধি, চেতনা ও অনুভূতি দেওয়া হয়েছে তা অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বেশি। কিন্তু ততটুকু বেশি যাতে তারা নিজেদের পানাহার, উদরপূর্তি ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি

ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারে, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এসবের পরে আসে মানুষের নম্বর, যার অস্তিত্বের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হল নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা চেনা, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলা, তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া। সমগ্র বস্তুজগতের পরিণতি ও ফলাফলকে উপলব্ধি করা, আসল ও মেকী যাচাই করে যা ভাল, মঙ্গল, কল্যাণকর সেগুলোকে গ্রহণ করা, আর যা কিছু মন্দ, অকল্যাণকর সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। এ কারণেই মানবজাতি এমন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়েছে, জীবনের উন্নতি লাভের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। মানুষ উন্নতি লাভ করে ফেরেশতাদের কাতার থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। একমাত্র মানুষের মাঝে এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তার কর্মের জন্য ভালমন্দ প্রতিদান রয়েছে। যে কারণে তাদেরকে বুদ্ধিজ্ঞান এবং চেতনা-উপলব্ধিও দেওয়া হয়েছে সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অধিক, যাতে করে সাধারণ জীবের স্তরের উর্ধ্বে উঠে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মুতাবিক কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ বুদ্ধি, চেতনা ও উপবব্ধিকে এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তিকে যেন সেমত কাজে নিয়োগ করে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসে যাবার পর একজন মানুষের বোঝা, তার দর্শন ও শ্রবণ অন্যান্য জীব-জন্তুর বোঝা, শোনা ও দেখা থেকে ভিন্ন রকম হওয়াই উচিত। মানুষও যদি নিজেদের দর্শন, শ্রবণ ও বিবেচনাশক্তিকে তেমনি কাজে নিয়োগ করে, যেমন কাজে অন্য জীব-জন্তুরা নিয়োগ করে থাকে এবং মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকা, কল্যাণ ও মঙ্গলকর বিষয়কে গ্রহণ করা প্রভৃতি যেসব কাজ নির্ধারিত ছিল, সেগুলোর প্রতি যদি লক্ষ্য না রাখে, তবে বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্বোধ বলা হবে, চোখ থাকা সত্ত্বেও তাকে অন্ধ এবং কান থাকা সত্ত্বেও তাকে বধির বলেই আখ্যায়িত করা হবে। সেজন্যই কোরআন করীম অন্যত্র এ ধরনের লোকদেরকে صم بكم, ও عمى অর্থাৎ কালা, বোবা ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছে।

এতে একথা বিবৃত করা হয়নি যে, তারা নিজেদের পানাহার, থাকা-পরা ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কেও বুঝে না কিংবা জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখতে বা শোনতে পায় না ; বরং স্বয়ং কোরআন করীম তাদের সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছে- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ অর্থাৎ "তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু আখিরাত সম্পর্কে একান্ত গাফিল।" আর ফিরাউন,

হামান এবং তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছে ঃ-وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ অর্থাৎ 'তারা একান্তভাবেই বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল।' কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দর্শনক্ষমতার ব্যবহার যেহেতু শুধুমাত্র সে পর্যায়েই সীমিত ছিল, যে পর্যায়ে সাধারণ জীব-জন্তুর থাকে—অর্থাৎ শুধু পেট ও শরীরের সেবা করা, আত্মার সেবা কিংবা তার তৃপ্তি সম্পর্কে কোন কিছুই না ভাবা বা না দেখা—সেহেতু তারা এই বৈষয়িকতা ও সামাজিকতায় যত উন্নতি-অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন, চন্দ্র ও মঙ্গলের অভিযানে যত বিজয়ই অর্জন করুক না কেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহে সমগ্র নভোমণ্ডলকে ভরে দিক না কেন, কিন্তু এসব পেট ও শরীরেরই সেবা, তার চেয়ে অধিক কিছু নয়। আত্মার স্থায়ী শান্তি ও তৃপ্তির জন্য এগুলোতে কিছুই নেই। কাজেই কোরআন তাদেরকে অন্ধ-বধির বলেছে। এ আয়াতে তাদের উপলব্ধি, দর্শন ও শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বোঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যা কিছু তাদের শোনা উচিত ছিল তা তারা শোনেনি। আর যা কিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শুনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীব-জন্তুর পর্যায়ের বোঝা, দেখা ও শোনা, যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান।

এ জন্যই উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত, শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। রুটি আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতপর বলা হয়েছে-بَلْ هُمْ أَضَلُّ (অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট।) তার কারণ চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার শরীয়তের বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত নয়। তাদের জন্য কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট, এতটুকুই তাদের জন্য যথার্থ। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেজন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বসা জীব-জন্তুর চেয়েও অধিক নির্বুদ্ধিতা। তাছাড়া জীব-জানোয়ার নিজের প্রভু ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পরওয়ারদিগারের আনুগত্যে ত্রুটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুষ্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশি নির্বোধ ও গাফিল প্রতিপন্ন হয়। কাজেই বলা হয়েছে-أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ অর্থাৎ এরাই হলো প্রকৃত গাফিল।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ
فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۭ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(১৮০) আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ভাল ভাল সব নাম (নির্ধারিত) রয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য। কাজেই তোমরা সেসব নামেই আল্লাহ্‌কে অভিহিত করো। আর (অন্য কারো জন্য এসব নাম ব্যবহার করো না। বরং) এমন লোকদের সাথে সম্পর্কও রেখো না, যারা তাঁর (উল্লিখিত) নামের ব্যাপারে (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এসব নাম প্রয়োগ করে) বাঁকা পথে চলে (যেমন, তারা গায়রুল্লাহ্‌কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আকীদার সাথেই উপাস্য বলে অভিহিত করতো)। তারা যা কিছু করছে, তার শাস্তি অবশ্যই পাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সে সমস্ত জাহান্নামবাসীর আলোচনা ছিল, যারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেতনা-অনুভূতিকে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের দর্শন, শ্রবণ কিংবা উপলব্ধি করার কাজে ব্যয় করেনি এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী ও অন্তহীন জীবনের জন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করেনি। ফলে আল্লাহ্ প্রদত্ত তার জ্ঞান-বুদ্ধিও বিনষ্ট হয়ে গেছে—আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও কল্যাণ লাভে তারা গাফিল হয়ে পড়েছে এবং চতুষ্পদ জীব-জন্তু অপেক্ষাও অধিক গোমরাহী আর নির্বুদ্ধিতার অভিশাপে পতিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের উপসর্গের উপশম ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও দোয়ার আধিক্যই হলো এ রোগের চিকিৎসা। وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا— অর্থাৎ সব উত্তম নাম আল্লাহ্‌রই জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।

'আসমায়ে-হুসনা' বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ ঃ উত্তম নাম বলতে সেই সমস্ত নামকে বোঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলা বাহুল্য, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর, যার উর্ধ্বে আর কোন স্তর থাকতে

পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যে কোন পূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি পূর্ণতর এবং জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হতে পারে। فَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيْمٌ -এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, এসব আসনায়ে-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ ---এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহ্র সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহ্কে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহ্বান করা হলো 'দোয়া' শব্দের অর্থ। আর 'দোয়া' শব্দটি কোরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল আল্লাহ্র যিকির, প্রশংসা ও তসবীহ-তাহ্লীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হল নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوْهُ بِهَا শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হল এই যে, হামদ, সানা, গুণ ও প্রশংসাকীর্তন, তসবীহ-তাহ্লীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে। আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা আল্লাহ্র নাম বলে প্রমাণিত।

দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা ঃ এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনার বিষয়ে দু'টি হিদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমত আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যে কোন শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহ পরবশ হয়ে আমাদের সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন, যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। সেই সাথে এ সমস্ত শব্দেই তাঁকে ডাকার জন্য আমাদের বাধ্য করে দিয়েছেন, যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের

পরিবর্তন না করি। কারণ আল্লাহ্‌র গুণ-বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের ঊর্ধ্বে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (র) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম পাঠ করে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা হয়, তা কবুল হয়। আল্লাহ্‌ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন ঃ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।' উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দোয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা এমন নেই, যাতে কোন না কোন ক্ষতির আশংকা থাকবে না এবং ফল লাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোন ক্ষতির আশংকা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হল এই যে, দোয়া যে একটি ইবাদত তার সওয়াব দোয়াকারীর আমল-নামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া হল ইবাদতের মগজ। যে উদ্দেশ্যে মানুষ দোয়া করে, অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্‌ স্বীয় অনুগ্রহে সে দোয়াকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহ্‌র হামদ ও সানার মাধ্যমে যিকির করা হলো ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি মানুষের মুহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখকষ্ট উপস্থিত হলেও শীঘ্রই সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোক চিন্তাভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এরূপ ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

'মুসতাদরাকে হাকিম,' হযরত আনাস (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (রা)-কে বলেন, আমার ওসীয়তগুলো শুনে

নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে! সে ওসীয়তটি হল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ে নেবে ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

এ আয়াতটি সমস্ত মকসূদ ও জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তুলনাহীন।

সারকথা হল এই যে, উল্লিখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দু'টি হিদায়েত দান করা হয়েছে। একটি হল এই যে, যে-কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যে-কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে ডাকবে; কোন সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হলো এই যে, তাঁকে সে নামেই ডাকবে, যা আল্লাহ্ তা'আলার নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; তার শব্দের কোন পরিবর্তন করবে না।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ- وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ সেসমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে-হুস্‌নার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামির প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী اِلْحَادٌ (ইলহাম) অর্থ ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া। এ কারণেই বগলী কবরকে لَحْد বলা হয়। কারণ তাও মধ্য থেকে সরে থাকে। কোরআনের পরিভাষায় اِلْحَاد বলা হয় কোরআনের সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক-সেদিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জুড়ে দেওয়াকে।

এ আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে হুস্‌নার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে থাকে।

আল্লাহ্‌র নামের বিকৃতি সাধনের নিষেধাজ্ঞা এবং তার কয়েকটি দিক ঃ আল্লাহ্‌র নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন কোন নাম ব্যবহার করা, যা কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সত্যপন্থী ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ্‌র

নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কারোই এমন কোন অধিকার নেই যে, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণকীর্তন করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক, যা কোরআন ও সুন্নাহ্তে আল্লাহ্ তা'আলার নাম কিংবা গুণবাচক হিসাবে উল্লিখিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ্কে 'করীম' বলা যাবে কিন্তু 'সখী' বা 'দাতা' বলা যাবে না। 'নূর' বলা যাবে, কিন্তু 'জ্যোতি' বলা যাবে না। 'শাফী' বলা যাবে, কিন্তু 'তবীব' বা 'চিকিৎসক' বলা যাবে না। কারণ এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কোরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

ইসলামে বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থা হলো আল্লাহ্র যে সমস্ত নাম কোরআন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বোঝা যায়।

কোন লোককে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্ধারিত নামে সম্বোধন করা জায়েয নয়ঃ তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোন লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে-হুস্নাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কোরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো জন্য ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রাহীম, রাশীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো জন্য যেসব নামের ব্যবহার কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লিখিত ইলহাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং নাজায়েয ও হারাম। যেমন, রাহ্মান, সুবহান, রাযযাক, খালেক, গাফ্ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি।

তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রাযযাক মনে করা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফর। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বোঝার দরুন কাউকে খালেক, রাযযাক, রাহমান কিংবা সুবহান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শেরেকী সুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে।

পরিতাপের বিষয়, ইদানিং সাধারণভাবেই মুসলমানরা এই ভুলে নিপতিত। কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা ইসলামী নাম রাখাই ছেড়ে দিয়েছে। তাদের আকার-অবয়ব ও স্বভাব-চরিত্রে তাদেরকে মুসলমান বলে বোঝা এমনিতেই কঠিন হয়ে পড়েছিল, যা-ও নামের দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল, তাও ইংরেজী কায়দায় নতুন নাম রাখা হচ্ছে।

মেয়েদের নাম ইসলামী মহিলাদের নাম; খাদীজা, আয়েশা, ফাতেমার পরিবর্তে নাসীম, শামীম, শাহনায, নাজমা, পারভীন হয়ে যাচ্ছে। আরো বেশি আফসোসের ব্যাপার এই যে, যাদের ইসলামী নাম আবদুর রাহমান, আবদুর রায্যাক, আবদুল গাফ্ফার, আবদুল কুদ্দুস প্রভৃতি রাখা হয়েছে বা হচ্ছে তাতে সংক্ষেপনের এই ভুল পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যে, এসব নামের শুধুমাত্র শেষ অংশটুকুতে তাকে পূর্ণ নামের বদলে সম্বোধন করা হয়—রাহ্মান, খালেক, রায্যাক আর গাফ্ফারের খেতাব দেয়া হয় মানুষকে। এর চাইতেও গজবের ব্যাপার হলো যে, 'কুদরতুল্লাহ্'কে আল্লাহ্ সাহেব আর কুদরতে-খোদাকে খোদা সাহেব নামেও ডাকা হয়। বস্তুত এ সবই নাজায়েয, হারাম এবং মহাপাপ বা কবীরা গোনাহ্। এসব শব্দ (এসব ক্ষেত্রে) যতবার ব্যবহার করা হয়, ততবারই কবীরা গোনাহ্ হয় এবং যে শোনে সেও পাপমুক্ত থাকে না।

এ সমস্ত স্বাদ ও লাভহীন পাপকে আমাদের হাজার হাজার মুসলমান ভাই দিন-রাত্রির নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত করে রেখেছে অথচ চিন্তাও করছে না যে, এই সামান্য বিষয়টির পরিণতি কত ভয়াবহ। এরই প্রতি উল্লিখিত আয়াতের سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ বাক্যের সতর্কতা উচ্চারণ করা হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের বদলা শীঘ্রই দেওয়া হবে। সে বদলা নির্ধারণ করা হয়নি। আর এই নির্ধারণ করাতেই কঠিন আযাবের ইঙ্গিত বোঝা যায়।

যে সমস্ত পাপে কোন পার্থিব স্বাদ ও আয়েশ কিংবা উপকারিতা বিদ্যমান, সেগুলোর ব্যাপারে হয়তো বা কেউ বলতে পারে আমি আমার কামনা-বাসনা কিংবা প্রয়োজনের কারণে এগুলো করতে বাধ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ইদানিংকালে মুসলমানরা এমন বহু নিরর্থক পাপেও নিজেদের মূর্খতা কিংবা শৈথিল্যের কারণে লিপ্ত রয়েছে যাতে না আছে কোন পার্থিব লাভ, না আছে সামান্যতম আনন্দ বা স্বাদ। তার কারণ হচ্ছে এই যে, হালাল-হারামের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্য থাকেনি (নাউযুবিল্লাহি মিন্হু)।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَأُمْلِيْ لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ أَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّأَنْ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۚ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ۝

(১৮১) আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে। (১৮২) বস্তুত যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না। (১৮৩) বস্তুত আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল অতি পাকা। (১৮৪) তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, তাদের সঙ্গী লোকটির মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি নেই? তিনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী প্রকৃষ্টভাবে। (১৮৫) তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা বস্তু সামগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? বস্তুত এরপর কিসের উপর ঈমান আনবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমার সৃষ্ট জ্বিন ও ইনসানের মধ্যে (সবাই গোমরাহ্) নয়, বরং তাদের মধ্যে একটি দল এমন রয়েছে, যারা সত্য ধর্ম (ইসলাম) অনুযায়ী (মানুষকে) হিদায়েত (-ও) করে থাকে এবং সে অনুযায়ী (নিজের ও অন্যদের বিষয়ে) ন্যায়-সংগত ইনসাফও করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাচ্ছি এমনই ভাবে যে, তারা টেরও পাচ্ছে না। আর (পৃথিবীতে আযাব আরোপ করা থেকে) তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি। নিঃসন্দেহে আমার ব্যবস্থা সুদৃঢ়। তারা কি এ ব্যাপারে চিন্তা করেনি যে, যার সাথে তাদের পালা পড়েছে তাঁর মাথায় এটুকুও বিকৃতি নেই? তিনি শুধু পরিষ্কার (আযাবের ব্যাপারে) ভীতি দর্শনকারী (যা মূলত পগয়ম্বরদেরই কাজ)। আর তারা কি আসমান ও যমিনের বিশাল জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করেনি এবং এর অন্যান্য জিনিসের সম্পর্কে যা আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন (যাতে তাদের তওহীদ সম্পর্কে প্রামাণিক জ্ঞান লাভ হতে পারে? আর এ ব্যাপারেও চিন্তা করেনি) যে, হয়তো শেষ সময় (অর্থাৎ মৃত্যুকাল) সন্নিকটে এসে পৌঁছেছে? (তাহলে তারা আযাবের আশংকা থেকে ভয় পেতে পারত এবং তা থেকে অব্যাহতি লাভের চিন্তা করত—আর এভাবে পেতে পারত সত্য ধর্মের সন্ধান। বস্তুত মৃত্যুর আশংকা সর্বক্ষণই রয়েছে। আর কোরআন যে প্রবল ভাষায় এ এ বিষয়টি ব্যক্ত করছে, তাতেও যদি তাদের চিন্তা ও অনুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি না হয়, তাহলে) আর কোরআনের পর কোন্ বিষয়ের উপর তারা ঈমান আনবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে জাহান্নামবাসীদের অবস্থা ও দোষ-গুণ এবং তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সামর্থ্যসমূহকে যথার্থ ব্যবহার করেনি, সেগুলোকে সঠিক কাজে না লাগিয়ে বিনষ্ট করে দিয়েছে। অতপর তাদের এ অবস্থার প্রতিকার বলা হয়েছে আসমায়ে হুসনা

ও আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে। আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম আয়াতে তাদের মুকাবিলায় যারা ঈমানদার, যারা সত্যপন্থী, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ্যকে সঠিক কাজে ব্যবহার করে সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ অর্থাৎ আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা ন্যায়ের ভিত্তিতে হিদায়েত করে অর্থাৎ মানুষকে সরল পথের দিশা দেয়। আর যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাদ কিংবা মামলা-মুকদ্দমা দেখা দেয়, তখন তারা নিজেদের সে বিবাদের মীমাংসাও আল্লাহ্‌র ন্যায়ানুগ আইনের ভিত্তিতেই করে নেয়।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে জারীর নিজের সনদে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর বললেন, এ আয়াতে যে উম্মতের কথা বলা হয়েছে সে উম্মত হল আমার উম্মত, যারা নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করবে ন্যায়ের ভিত্তিতে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আইন মুতাবিক। আর যাবতীয় লেন-দেনের ব্যাপারে ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

আবদ্ ইবনে হুমাইদের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ আয়াতটি তোমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তোমাদের পূর্বেও একটি উম্মতকে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছিল। অতপর তিনি তিলাওয়াত করলেন وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-র উম্মতের মধ্যেও একটি দল এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। তারাও মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন এবং নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ব্যাপারে ন্যায়ের অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করত। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতকেও আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যে অনন্য করে দিয়েছেন।

এর সার-সংক্ষেপ হল দুটি চরিত্র। একটি হলো অন্যান্য লোকের নেতৃত্ব দান, পথ প্রদর্শন কিংবা পরামর্শ দানে শরীয়তের অনুসরণ করা। দ্বিতীয়টি হলো পরস্পরের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হলে শরীয়তের আইন অনুসারে তার মীমাংসা করা।

লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এ দুটি চরিত্রই এমন যা কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের মঙ্গল, সুখ-সাচ্ছন্দ্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের যমীন হতে পারে যে, শান্তি ও যুদ্ধ আর মৈত্রী ও শত্রুতা যে কোন অবস্থায়ই তাদের নীতি হবে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ। বন্ধু হোক আর প্রতিপক্ষ হোক, যাকেই যে পরামর্শ দেবে, যে কর্মপন্থা বাতলাবে, তাতে ন্যায়েরই অনুসরণ করবে। আর প্রতিপক্ষের সাথে বিবাদের ক্ষেত্রেও ন্যায়ের সমর্থনে